হিন্দু সংহতি

সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

দ্বিতীয় বর্ষ, দশম সংখ্যা, মে ২০১০, কলকাতা ✿ মূল্য ঃ ১.০০ টাকা

সাবধানের বিষয় এই যে, অনেক সময় ভক্তিমাত্রেই চরিত্র গঠিত হয় না। আচার পূত (moral) না হইলে কাহারও ভক্তিতে অধিকার নাই, ইহা বিশেষ রূপে মনে রাখিতে হইবে। সঙ্কীর্ত্তনের উৎসাহে লম্ফঝম্প করিয়া স্নায়ুমণ্ডলীকে পর্য্যস্ত (আহত) করত: মূর্চ্ছাগ্রস্ত হওয়াই ভক্তি নহে, ইহাও যেন সকলের মনে থাকে। —স্বামী বিবেকানন্দ

হরিণঘাটা থানায় বিক্ষোভ

৫ই মে নদীয়া জেলার হরিণঘাটা থানায় হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। গত ২৮শে মার্চ এই থানার অন্তর্গত পাগলাতলা মেলায় মুসলিম দুষ্কৃতিদের হামলা, মন্দির ও দেবতার বিগ্রহ ভাঙ্গা, মেয়েদের শ্লীলতাহানি ও লুঠপাটের প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। শুধু মেলা আক্রমণই নয়, ওই এলাকায় বেশ কয়েক বছর ধরে হিন্দুদের উপর মুসলিম দুষ্কৃতকারীদের অত্যাচার চলছে। গত দুর্গাপূজার সময় জলকর ভোমরা গ্রামে সাতমাসের গর্ভবতী গৃহবধূ প্রার্থনা মণ্ডলের উপর অত্যাচারের ফলে অসময়ে বিকৃত অঙ্গ সন্তান প্রসব, গত ৮ই এপ্রিল সিংহা মাঠপাড়া গ্রামে গৃহবধূ নমিতা মণ্ডলকে মেরে অজ্ঞান করে দেওয়া এরকম বহু ঘটনাতে হিন্দুরা অতিষ্ট। কিন্তু ঐ মুসলিম দুষ্কৃতকারীরা ভোটলোভী রাজনৈতিক দলগুলির আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে থাকায় অত্যাচারিত হিন্দু প্রতিবাদ করার সাহস পায় না। গত পাগলাতলা মেলা আক্রমণের ঘটনার পর হিন্দু সংহতির কর্মীরা ঐ নিপীড়িত হিন্দুদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোতে তারা কিছুটা সাহস পেয়েছে। সেই সাহসটুকু সম্বল করে ৫ই মে এই বিক্ষোভের আয়োজন হয়েছিলো।

৫০০-র বেশি পুরুষ ও মহিলা পাগলাতলা থেকে চড়া রোদে ছয় কিলোমিটার হেঁটে মিছিল করে হরিণঘাটা থানায় আসে। তাদের হাতে ছিল অত্যাচার ও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে প্ল্যাকার্ড, আর মুখে ছিল স্লোগান। বেলা তিনটেয় হরিণঘাটা থানার সামনে মঞ্চ বেঁধে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ, অ্যাডভোকেট তুষারকান্তি টিকাদার, অ্যাডভোকেট বি. এন. রায় এবং আরো অনেকে। বক্তব্যের পর হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে আটজনের একটি প্রতিনিধি দল থানার ভিতরে গিয়ে ডেপুটেশান ও স্মারকলিপি প্রদান করেন। কল্যানী মহকুমার এস. ডি. পি. ও ভাস্কর মুখার্জী ও হরিণঘাটা থানার আই. সি. সুব্রত সরকার স্মারকলিপি গ্রহণ করেন এবং প্রতিনিধি দলের বক্তব্য শোনেন। তাঁরা আশ্বাস দেন অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা ও শাস্তি দেওয়া হবে।

ব্যারাকপুর স্পোর্টস্ কমপ্লেক্সে

মহিলা খেলোয়াড়দের শ্লীলতাহানি

১৬ এপ্রিল, ২০১০। ব্যারাকপুরের ওয়্যারলেস গেট রয়াল পার্ক এলাকায় ব্যারাকপুর স্পোর্টস্ কমপ্লেক্সের মাঠে ছেলে-মেয়েরা নিয়মিত অনুশীলন করে। আর তাদের নিয়মিত উত্যক্ত করে মোহনপুরের (চোপকাঠালিয়া) মসজিদ পাড়ার কিছু মুসলিম ছেলে (১৬-২২ বছর)। এদিন তাদের চপলতা সীমা ছাড়াল। তারা একটি মেয়েকে (ডোনা) মাঠ থেকে ডেকে তার ও অন্যান্য মেয়ে ক্রীড়াবিদদের মোবাইল নম্বর দিতে বলে। মেয়েটি ভয় পেয়ে মাঠের অন্য দিকে চলে গেলে তারা সিটি দিতে দিতে চিৎকার করে বলে, ''আমরা তোদের বাড়ী যাব, তোদের বিছানায় বসব, তোদের .....।''

এসব নোংরা গালাগালি শুনে অনুশীলনরত কয়েকটি ছেলে প্রতিবাদ করলে ঐ মুসলিম ছেলেরা তাদেরও চড়-থাপ্পড় মারে। তাদের ভয়ে ক্রীড়াবিদ ছেলে ও মেয়েরা ক্লাব বিল্ডিং-এ আশ্রয় নেয়।

এর পরে বিকাল ৬ টা নাগাদ দুষ্কৃতিরা আরও বেশী সংখ্যায় প্রায় ৫০-৬০ জন, সকলেরই বয়স ১৬ থেকে ২২, এসে ক্লাব বিল্ডিংয়ে চড়াও হয়ে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে পেটাতে লাগল ও গুরুতরভাবে তাদের শ্লীলতাহানি করল। আহত পূজা সিংহ আমাদের প্রতিনিধির কাছে অত্যাচারের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা কাগজের পাতায় লেখা কঠিন। ৫/৬ জন মেয়ে খেলোয়াড় গুরুতর আহত। পূজা সিংহ (১৭) এবং ডলি বিশ্বাস (১৪) নির্দয় ভাবে প্রহৃত। পূজাকে সারদা নার্সিং হোমে ২ দিন চিকিৎসায় থাকতে হলেও ক্লাব কর্তৃপক্ষের নির্লিপ্ততা ও উদাসীনতা ছিল চরমে। আমাদের সংহতির কর্মীরা খেলোয়াড়দের সাথে যোগাযোগ করে ক্লাব সেক্রেটারী অজয় বর্মন রায়ের নিকট গেলে তিনি দুষ্কৃতিদের নিয়মিত উত্যক্ত করার ঘটনায় চুপ করে থাকেন এবং সংহতি কর্মীদের বলেন যে এমন কিছু যেন লেখালেখি না করা হয় যাতে ঐ মুসলিম ছেলেদের মাঠে আসা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর তিনি স্পোর্টস কমপ্লেক্সে বিষ্ণুপদ চাকির সাথে কথা বলতে বলেন। চাকি বললেন— মুসলিম ছেলেরা গণ্ডগোল করছিল। তবে মোহনপুরের সালাম, কালাম এবং মোবারা ঐ ছেলেদের হটিয়ে দেয়। ক্লাব কর্তৃপক্ষ একটি সাধারণ অভিযোগ টিটাগড় থানায় করে। (জিডি ১২১১ তাং ১৬.৪.১০) কোনও দুষ্কৃতির নাম ছিল না। এলাকা, ক্লাব, পঞ্চায়েত, ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটি সবই সিপিএমের দখলে। অথচ সকলেই নীরব দর্শক। এলাকার মহিলা খেলোয়াড়দের সম্ভ্রম রক্ষায় তারা অসমর্থ। পুলিশ-প্রশাসন তো আগে থেকেই ঘোমটা দিয়ে আছে। দুষ্কৃতিরা মুসলিম বলেই কি সাত খুন মাপ!

মুর্শিদাবাদের পাঁচথুপীতে দাঙ্গা

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার বরোয়াঁ থানা এলাকার বরোয়াঁ ব্লকটি জেলার একমাত্র হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ (২০০১ সালে ৫৯.৬৬%) ব্লক। বাকি ২৫ টি ব্লকেই মুসলমানেরা সংখ্যারিষ্ঠ। জেলার মুসলিম সংখ্যা ৬৩.৬৭%।

এবারে মারদাঙ্গা করে হিন্দুদের বিতাড়িত করে সম্ভবতঃ বরোয়াঁ দখল হতে চলেছে। এই ব্লকে পাঁচথুপী গ্রামে ১৪ এপ্রিল থেকে খুন-দাঙ্গা-বোমাবাজি শুরু হল এক সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে। গ্রামে চড়ক পূজার শিবভক্তেরা একটা টিউবওয়েল থেকে জল খাচ্ছিলেন। তখন এক দল মুসলিম ছেলে ভক্তদের গায়ে মুখের জল ছেটায়। এর প্রতিবাদ করলে দু'দলে মারামারি হয়ে উভয় পক্ষেই কয়েক জন আহত হন। স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে বরোয়াঁ থানার ও সি এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উদ্যোগে উভয় পক্ষের লোক নিয়ে এক শান্তি কমিটি তৈরী হয়। কিন্তু দু দিন পরেই ১৬ এপ্রিল সকাল থেকেই ৩০০-৪০০ মুসলিম হঠাৎ হিন্দুদের উপর বোমাবাজি করতে করতে হিন্দুদের দোকান ও বাড়ি লুট করে পোড়াতে আরম্ভ করল। পিঠে বোমার আঘাতে ২২ বছরের তরতাজা যুবক সুজিত ঘোষ (পিতা পরাধীন ঘোষ) কে খুন করা হল। মুড়ি-মুড়কির মতো হিন্দুদের বাড়ী ঘরদোর লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া হতে লাগল। দক্ষিণপাড়ার প্রাক্তন গ্রামপ্রধানের বাড়ীও পুড়ল, পলাশ ঘোষের মিষ্টির দোকান সহ বহু ঘরবাড়ী, দোকান লুণ্ঠিত হল, পরে পুড়ল। অসতর্কিত হিন্দু আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হল। গুরুতর আহতদের পাঠানো হয় বহরমপুর জেলা হাসপাতালে। শুধু পাঁচথুপী গ্রামেই নয়, ৬ কিমি দূরে ডাকবাংলো বাজারেও চলল লুঠ আর অগ্নিসংযোগ। মুসলিম দুষ্কৃতিরা পূর্ব পরিকল্পিত দাঙ্গা ঘটাতেই মোকামপাড়া, গোদাপাড়া এমন কি শুষ্ক ময়ূরাক্ষী নদের ওপারের কুলিয়া গ্রাম থেকে দল বেঁধে এসেছিল।

দাঙ্গা, লুঠ, খুন-জখম সব হয়ে যাওয়ার পর বিক্ষুব্ধ হিন্দুদের আটকে রেখে দুষ্কৃতিদের রক্ষা করতে পুলিশ ও র‍্যাপিড একশান ফোর্স এসে যাদব আর সদ্‌গোপ পাড়ার লড়াকু হিন্দুদের ঘিরে রাখল। কিন্তু একতরফা মার খেয়ে হিন্দুরা আর কত দিন এখানে থাকতে পারবেন, সে নিয়ে তাঁরা শঙ্কিত। তাঁদের শঙ্কার আরও কারণ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পারভেজ সিদ্দিকির আচরণ। প্রত্যন্ত মসজিদ গুলিতেও শুক্রবার গিয়ে নামাজ পড়ে ঐ মসজিদগুলিকে জনপ্রিয় সক্রিয় করার প্রচেষ্টায় ডিএম সাহেবের অতিরিক্ত মাখামাখিতে হিন্দুরা আতঙ্কিত, ভয়ার্ত।

এখনও ২০০-র বেশী হিন্দু ও মুসলমানকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে রেখেছে। এদের মধ্যে ২৭জন হিন্দুকে মার্ডার কেস ও ৩৪ জন হিন্দুকে বোমার কেস দিয়েছে। হিন্দু যুবকরা গ্রেপ্তারের ভয়ে রাতে বাড়িতে থাকতে পারছে না। শান্তি কমিটি ও শান্তি মিছিলের নাটক যথারীতি চলছে।

আমাদের কথা

সংগ্রাম ও জয়লাভের মাধ্যমে ঐক্য

আমাদের নির্দিষ্টভাবে কাজটা কী? হিন্দুদের মধ্যে একটা সংগঠন গড়ে তোলা? না। আমাদের কাজ হিন্দুদেরকে সংহত করা, অর্থাৎ হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য বা একতা আনা। দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ আছে কি? হ্যাঁ, আছে। একটা সংগঠন মানে একটা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা দল। আর ঐক্য স্থাপন করা বা সংহত করা বা সংহতি গড়ে তোলা মানে হিন্দুদের মধ্যে একটা ঐক্যের ভাব আনা। সেখানে দলীয় বা সংস্থাগত পরিচয়টা বড় হবে না। আমি হিন্দু, সেও হিন্দু, তাহলে আমরা এক— এই ভাবটা বড় হবে। অনেকে বলবেন— সেটা করতেই তো সংগঠন চাই। না, ভুল। আমাদের দীর্ঘ সংগঠনের অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছি একটি সংস্থার প্লাটফর্মে বা একটি ব্যানারের নীচে কখনই খুব বেশী সংখ্যক মানুষের মধ্যে 'আমরা হিন্দু, তাই আমরা এক'— এই ভাব সৃষ্টি করা যায় না। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা হেডগেওয়ারজী ফর্মূলা— গ্রামে ১ শতাংশ, শহরে ৩ শতাংশ ৮৫ বছরেও লক্ষ্যপ্রাপ্তি হল না।

তাহলে অনেক বেশী সংখ্যক মানুষের মধ্যে 'আমরা হিন্দু'— এই ভাব গড়ে তোলার উপায়টা কী? আছে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। আজকাল ক্রিকেট খুব জনপ্রিয়। আমরা সবাই ভারতের সমর্থক। কিন্তু কাজের ব্যস্ততার জন্য অনেকেই সব সময় খেলার দিকে নজর রাখতে পারে না। এখন একটু ভেবে দেখুন তো— যখন ভারত ক্রিকেটে কোন দেশের কাছে হারে— তখন কতজন কষ্ট পায়, বা কতজন ঐ পরাজয়ের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে? অনেকেই করে। কিন্তু একবার তুলনা করুন তো— যখন ধোনি সহবাগরা কোন দেশকে পিটিয়ে জেতে, তখন 'আমি ভারতীয়' এই ভাবটা মনে আসা এবং 'এই জয় আমাদের জয়' এই মনোভাব তৈরী হওয়া— কোন্ সংখ্যাটা বেশী? এই দ্বিতীয় সংখ্যাটা অনেক বেশী। পরাজয়ের মধ্য দিয়ে একাত্মতা অনুভব করার সংখ্যার থেকে জয়ের মধ্য দিয়ে একাত্মতা অনুভব করার সংখ্যা অনেক বেশী। তাহলে যদি বেশী সংখ্যক মানুষের মধ্যে একতার ভাব তৈরী করতে হয়, তাহলে জয়ের স্বাদ দেওয়ার থেকে শ্রেষ্ঠ উপায় আর কোন কিছু নেই। মোটা কথায়— শোক মিছিলের থেকে বিজয় মিছিলের সংখ্যা সব সময় বেশী হবে। শুধু সংগঠন সংগঠন জপ করলেও হবে না, নিপুণ সাংগঠনিক পদ্ধতি অবলম্বন করেও হবে না, বিশাল একতা নির্মাণ করতে হলে জিততে হবে। আর তার জন্য লড়তে হবে। আমাদের সাংগঠনিক সূত্র এইটি। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ঐক্য। জয়ের মধ্য দিয়ে আরও বড় ঐক্য, অর্থাৎ সংহতি।

কথা তো এতগুলো বলা হল। এর প্র্যাক্টিক্যাল হচ্ছে কি? হ্যাঁ, হচ্ছে। গত ৫-৬ মাসের মাসিক বৈঠকগুলোতে যে খবরাখবর পাওয়া গিয়েছে (নিয়মিত তো খবর আসছেই), তা থেকে বলা যায় যে সংহতি কর্মীদের লড়াইয়ের অভ্যাস হচ্ছে। বনগাঁতে অন্ততঃ ৩ জন হিন্দুর জমি মুসলমানদের কবল থেকে সংহতি কর্মীরা উদ্ধার করে দিয়েছে। বেশ কয়েকটি হিন্দু মেয়েকে মুসলমানের খপ্পর থেকে বাঁচিয়েছে। আর এ সবগুলোর জন্যই সংগ্রাম করতে হয়েছে, রক্ত ঝরাতে হয়েছে। ক্যানিং-এর সংহতি কর্মীরা তো আগে থেকেই লড়াইয়ে অভ্যস্ত। রক্ত, হাতিয়ার ও জেল তাদের কাছে নতুন কথা নয়। জয়নগর কুলতলি ব্লকে ছেলেরা লড়ছে। উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে লড়তে লড়তে নাকানি চোবানি খাচ্ছে, তবু লড়ছে। বিনা যুদ্ধে নাহি দিব এক বিন্দু মাটি— এই মনোভাব তৈরী হয়েছে। উস্থি ব্লকের ছেলেদের কাছেও লড়াই স্বাভাবিক ব্যাপার। আমাদের বাগনানের ছেলেরা একটু সফিস্টিকেটেড। কিন্তু তারাও লড়ছে এবং বেশ কিছু বিধর্মী দুষ্কৃতকারীকে উচিত শিক্ষা দিয়েছে। কুল্পী ব্লকের ছেলেরাও রণংদেহি মূর্তিতে আছে। সংগ্রাম চলছে। সম্ভবতঃ এই প্রথম দুষ্কৃতকারীরা ঘা খাচ্ছে। নদীয়ার শান্তিপুরে গোমাংস বিক্রির সক্রিয় ও সফল প্রতিবাদ করে আমাদের চারটি ছেলে কেস খেয়ে এল। এমনকি হাওড়া জেলার সাঁকরাইল ব্লকে রামচন্দ্রপুরে হিন্দু এলাকার মধ্যে ২০ জন মুসলমানকে খাসজমির পাট্টা দেবে বলে প্রশাসন হুমকি দিয়েছিল। পাট্টা বিলি করার জন্য ১৫০ পুলিশ নামিয়েছিল। হিন্দু সংহতি পাশে থাকায় স্থানীয় হিন্দুরা প্রশাসনের সেই অপচেষ্টাকে রুখে দিয়েছে। আরও অনেক লড়াই অনেক জায়গায় চলছে। সংগ্রামের মাধ্যমে ও বিজয়ের মাধ্যমেই হিন্দুদের মধ্যে বৃহত্তর সংহতি নির্মাণ সম্ভব— এটাই আমাদের থিয়োরী। প্র্যাকটিক্যাল করার দায়িত্ব সংহতি কর্মীদের।

মেদিনীপুরে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানার সরবেড়িয়া গ্রামে গত ১৭ এপ্রিল মোরাম রাস্তায় বাম্পার দেওয়াকে কেন্দ্র করে দুপুর প্রায় ১ টার সময়, অলক সামন্ত ও তার ভাই এর সঙ্গে পাশের চন্ডীপুর থানার ধুসিয়ার দুটি মুসলিম ছেলের সঙ্গে বচসা হয়। হাতাহাতি পর্যন্ত ঘটে। পরে মিটে যায় ও যে যার বাড়ী চলে যায়।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই প্রায় ২০০ মুসলিম নিয়ে এসে তারা অলক সামন্তর বাড়ি আক্রমণ করে। বাড়ি ভাঙচুর করে, মেয়েদের পোষাক ছিঁড়ে দেয় ও শ্লীলতাহানি করে। বাড়ি থেকে প্রায় ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা ও কয়েক ভরি সোনার গয়না লুঠ করে। প্রতিবেশীরা ছাড়াতে এলে তাদেরকেও মারধর করে। শেখ আলি, শেখ আসাদুল, শমিউল, শেখ নুরুল ইসলাম, শেখ মোরামিন, মেহবুব খান সহ আরো অনেকে এই আক্রমণের নেতৃত্বে দেয়। পুলিশকে জানালেও পুলিশ সঠিক সময় না এসে সন্ধ্যা প্রায় ৬ টার পরে এসে ঘুরে যায় ও শান্তি বজায় রাখার জন্য শাসিয়ে যায়। গ্রামবাসীরা পরে সক্রিয় প্রতিবাদ করলে প্রচুর পুলিশ নামিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। স্থানীয় সি পি এম নেতাদের ও পুরুষোত্তমপুরের তৃণমূল প্রধান শেখ শৈয়ত আলির চাপে পুলিশ রাত প্রায় ৩ টার সময় হিন্দু পাড়ায় রেড করে জোর করে ঘর থেকে অলক সামন্ত, শম্ভু সামন্ত, শিবশঙ্কর সিট, অনুপ ঘড়ই, মিলন ঘড়ই ও বুলা ঘড়ইকে তুলে নিয়ে যায় ও কেস দিয়ে দেয়। কেস নম্বর— ৩৯/২০১০। এদের বিরুদ্ধে ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ৩২৩, ৩২৫, ৩২৬, ৩৪১, ৩৭৯, ৪৩৫ ও ৫০৬ নং ধারা প্রয়োগ করা হয়। অথচ পুলিশ মাত্র ২ জন মুসলিমকে গ্রেফতার করেছে। যদিও থানায় ২০ জনের বিরুদ্ধে ডায়েরী করা হয়েছে। সরবেড়িয়া গ্রামের হিন্দুরা ক্ষোভে ফুঁসছে।

ফ্রান্সের পর বেলজিয়ামেও বোরখা বাতিল

ব্রাসেলস্, ২৪ এপ্রিল। ফ্রান্সে আগেই বাতিল হয়েছে। এ সপ্তাহ থেকে বেলজিয়ামেও বোরখা নিষিদ্ধ ঘোষিত হল। বেলজিয়ামের পার্লামেন্টে সর্বসম্মতিক্রমে বোরখা বিরোধী আইন পাশ হল। সরকারের বিশেষ অনুমতি পত্র ছাড়া বোরখা পরলে ৩০ ডলার ফাইন।

এই নিয়ে ইউরোপে দুটি দেশ মুসলিম মহিলাদের বোরখা পরা নিষিদ্ধ করল। জনসংখ্যা দিয়ে ইউরোপকে দখল করার চক্রান্ত সম্বন্ধে জনগণ দ্রুত সচেতন হচ্ছে। তারই প্রতিফলন ঘটছে ওখানকার পার্লামেন্টগুলিতে ইসলামিক কট্টরতা বিরোধী আইনপাশের দ্বারা।

কুল্পীর নির্যাতিত হিন্দু জনগনের পক্ষ থেকে হিন্দু সংহতির

সভাপতির নিকট খোলা চিঠি

মাননীয়,
শ্রী তপন কুমার ঘোষ,
সভাপতি, হিন্দু সংহতি, পশ্চিমবঙ্গ।
৫ ভুবন ধর লেন, কলকাতা- ৭০০ ০১২।

সাদর নমস্কার। ঈশ্বরের নিকট আপনার মঙ্গল কামনা করি। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের দুঃখ-দুর্দশা, নানা নিগ্রহের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াইয়ে আপনার প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য। নিম্নলিখিত নানা কারণে কুল্পী ব্লকের হিন্দুরা চিন্তিত ঃ-

১) বেলপুকুর হাসপাতাল মাঠে ২৭ বছরের পুরাতন দুর্গাপূজা বন্ধ করেছে সাম্প্রদায়িক মুসলমান শক্তি। সামনের বছর তারা কুল্পী বি ডি ও অফিসের মাঠের দুর্গাপূজা বন্ধ করতে চায়। তাদের পরিকল্পনা কুল্পী ব্লকের সমস্ত স্কুলে সরস্বতী পূজা বন্ধ করা।

২) হিন্দু এলাকায় হিন্দু পূজা-অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বহিরাগত মুসলমানদের উৎপাত বাড়ছে। কুল্পী হাটপাড়া-পুরাতনবাজার, গোপালনগর, ঈশ্বরীপুর-ভবানীপুর ও অন্যত্র পূজা-মেলা-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মুসলমানরা হিন্দু মেয়েদের উত্যক্ত ও পায়ে পা দিয়ে গণ্ডগোল করার চেষ্টা করেছে। হিন্দুরা সাধ্যমত প্রতিরোধ গড়লও পুলিশ-প্রশাসনের যথার্থ সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। উল্টে পুলিশ-প্রশাসন হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মুসলমান প্রতিনিধি রাখার সালিশি করছে।

মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য অনুমতির কোন তোয়াক্কা না করলেও, হিন্দু অনুষ্ঠানের অনুমতিতে সকল প্রকার প্রশাসনিক বাধা দান করা হচ্ছে।

৩) হিন্দু মেয়েদের ফুসলে নিয়ে যাওয়া বা জোর করে বিয়ে করার ঘটনা কুল্পী ব্লকে দিন দিন বাড়ছে। কুল্পী ব্লক হাসপাতালের এক কর্মচারীর মেয়েকে অপহরণ করে কিছুদিন বাইরে রাখার পর এলাকায় ঢোকানোর সময় হিন্দু যুবকরা কুল্পী মোড়ে মুসলিম দুষ্কৃতীদের চ্যালেঞ্জ জানায়। পিছু হটে যাওয়া মুসলিম দুষ্কৃতীদের (লাল) বাঁচাতে ময়দানে নামে এক মুসলিম প্রধান (সবুজ)। প্রমাণ হয় ভিন্ন রাজনীতি করলেও তারা মূলতঃ এক। হিন্দু বিরোধিতায়, হিন্দুর সর্বনাশে লাল-তেরঙ্গা-সবুজ সব সাম্প্রদায়িক মুসলমানই এককাট্টা। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মুসলমানরা সেখান থেকে অর্ন্তহিত।

৪) সম্প্রতি এক ধর্মান্ধ কুল্পী ব্লকের এক আধিকারিককে হত্যার হুমকি দেওয়াতে তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ অফিসে আসতে পারছিলেন না। একজন পঞ্চায়েত প্রধান প্রকাশ্যে পুলিশকে গালাগালি দিয়ে মজা পান। এই হল কুল্পী ব্লকের পুলিশ-প্রশাসনের অসহয়তার চিত্র। সেখানে সাধারণ মানুষের দুর্বিষহ অবস্থার কথা সহজেই অনুমেয়।

৫) কয়েক মাস আগে বাগাড়িয়া বাস স্টপে SD 19 রূটের এক হিন্দু কন্ডাকটরকে পিটিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করে মুসলিম দুষ্কৃতীরা। প্রতিবাদে কয়েকদিন রূটের বাস বন্ধ থাকে। ০৫/১১/০৯ রাতে মুসলিম ছিনতাইবাজরা রাধানগর হাট ফেরৎ এক হিন্দু ব্যবসায়ীর হাত কেটে মারাত্মক জখম করে পালায়। কুল্পী ব্লক প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, বিধায়ক, সভাপতি, রাজনৈতিক নেতারা নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন কিনা জানিনা। তবে এই হিন্দু নির্যাতনের ফল ভালো হবে না।

৬) কুল্পী এলাকার ঢোলা, বাগাড়িয়া, বেড়ন্দরী ইত্যাদি বহু জায়গাতে শরিয়তি শাসন শেষ কথা বলে। 'কাফের হিন্দুরা' সেখানে নির্যাতিত অবস্থায় দুঃসহ জীবন-যাপন করছে। সম্প্রতি নাকালীতে একটি দৈব পুকুরে স্নান করার মেলাকে কেন্দ্র করে আগত হিন্দু যাত্রীদের কাছ থেকে মুসলিম তোলাবাজরা জোর করে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করে। কুল্পী ব্লকের অসংখ্য অননুমোদিত ইসলামিক ইজতেমা ও জলসাতে প্রকাশ্যে দেশবিরোধী ও হিন্দু-বিরোধী আলোচনা হয়ে থাকে। পুলিশ-প্রশাসন জেনেও নির্বিকার।

কুল্পী ব্লকে সরকারী হিসাব অনুযায়ী ১৯৮১ সালের ৭১.৬২% হিন্দু কমে ২০০১ সালে ৬৩.২২%। আর ১৯৮১ সালের ২৭.৯৬% মুসলমান বেড়ে ২০০১ সালে দাঁড়িয়েছে ৩৬.৩৫%।

৭) নতুন বাংলা নববর্ষে (১৪১৭) ২রা বৈশাখ, ধনুমণ্ডল গোষ্ঠতলা প্রাঙ্গনে সন্ধ্যায় এক বিচিত্রানুষ্ঠানে পার্শ্ববর্তী পাড়ার মুসলিম দুষ্কৃতীরা অনুষ্ঠান পণ্ড করতে চায়। তাদের দাবী তাদের কথা অনুযায়ী অনুষ্ঠান চালাতে হবে। হিন্দুরা প্রতিবাদ করলে সংঘর্ষ বাঁধে। কয়েকজন আহত হয়। শোধ তুলতে পরেরদিন সেখ পাড়ার মুসলিমরা দুইজন হিন্দু জনগননা কর্মীকে (পান্নালাল সরদার ও প্রদ্যুত হালদার) বেঁধে রেখে হেনস্তা করে। মুসলিম মৌলভীদের প্ররোচনায় সেখ পাড়ার মুসলিমরা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে দফায় দফায় হিন্দু পাড়া আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। হিন্দু প্রতিরোধের মুখে দুষ্কৃতীরা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

গ্রামীন সালিশি উপেক্ষা করে, রাজনৈতিক প্ররোচনায় মুসলিমরা কুল্পী থানায় আলোচনাটি স্থানান্তরিত করে হিন্দুদের কাছ থেকে জরিমানা ও ক্ষমা স্বীকার করিয়ে নিতে চায়। দলমত নির্বিশেষে হিন্দু গ্রামবাসীরা এর তীব্র প্রতিবাদ করে। তারা বলে কুল্পীর গ্রামে গ্রামে ১০০/২০০ বছরের পুরাতন মেলাগুলিতে মুসলমানরা দলবদ্ধভাবে গণ্ডগোল বাধাচ্ছে। তাই ক্ষমা স্বীকারের কোন প্রশ্নই নেই। বরং প্রশাসন এবং পুলিশকে হিন্দু অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা দিতে হবে। ডায়মণ্ড হারবার এস ডি পি ও র নেতৃত্বে কুল্পী থানায় সিদ্ধান্ত হয়, উভয়পক্ষ শান্তি বজায় রেখে চলবে।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, মুসলমানরা ক্রমাগত হুমকী দিচ্ছে। স্কুলগামী গ্রামের মেয়েদের অশালীন ঈঙ্গিত করা হচ্ছে। রাতের অন্ধকারে হিন্দু বাড়ীতে হানা চলছে। আজ সংখ্যালঘুর সুযোগ আর রাজনীতির মদত শান্তিপ্রিয় হিন্দুকে সংঘর্ষের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

এই কঠিন অবস্থায় কুল্পীর হিন্দু যুব সমাজ হিন্দু সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। আমরা হিংসায় বিশ্বাসী নই। কিন্তু মুখ বুঝে মার খেয়ে পিছু হটবো না।

এই পরিস্থিতিতে হিন্দু সংহতির পথপ্রদর্শন কুল্পীর হিন্দুর অস্তিত্ব রক্ষায় অতি প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। মাননীয় হিন্দু সংহতির রাজ্য-সভাপতির নিকট আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে কুল্পীর নির্যাতিত হিন্দুদের মান-মর্য্যাদা ও নিরাপত্তার সুনিশ্চিতকরণে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

গৈরিক অভিনন্দন সহ-

সুবীর, বাপী, গৌতম, মিঠু, উজ্জ্বল, ভোলা, মিহির, ফটিক, নির্মল, বিকাশ, অরূপ, তাপস, রাজা, পার্থ, অশোক, অনুপ, তপন, সুকান্ত, অরিন্দম, বিশ্বজিৎ, নন্দদুলাল, নিতাই, কালীপদ, জয়কৃষ্ণ, দীপঙ্কর, সুকেশ, অসিত ও সাধুবাবা।

বলাঙ্গিরের শিবানী আচার্য্য

তপন কুমার ঘোষ

উড়িষ্যায় বলাঙ্গির নামে একটি জেলা সদর শহর আছে। সেখানে থাকেন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ হরিশচন্দ্র আচার্য্য। ব্রাহ্মণ। তিনি সরকারী চাকরি করেন। রাজ্য সরকারের রেভিনিউ অফিসার। তাঁর পত্নীও বলাঙ্গিরে একটি কলেজে লেকচারার। তাঁদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। মেয়েটি বড়। তার নাম শিবানী আচার্য্য। বয়স ১৯ বছর। সে বি. এস. সি. দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। তাছাড়াও কম্পিউটারে বি. সি. এ. কোর্সও করছে। ছেলেটি শিবানীর থেকে এক বছরের ছোট। সে ভুবনেশ্বরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। অর্থাৎ সুখী ও সম্পন্ন পরিবার।

এদের বাড়ীতে কিছু কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছিল। যথারীতি রাজমিস্ত্রি মুর্শিদাবাদের। উড়িষ্যা গরীব রাজ্য। আবার ধর্মপ্রাণ রাজ্যও। উড়িষ্যার সাধারণ মানুষের প্রভু জগন্নাথের প্রতি ভক্তি খুবই গভীর। তাই হয়ত উড়িষ্যাতে ধর্মান্তর কম হয়েছে। ভারতের মাত্র দুটি রাজ্য— উড়িষ্যা ও আসাম মুসলিম আক্রমণ ও আগ্রাসনকে সব থেকে বেশিদিন ঠেকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু উড়িষ্যার গরীব মানুষকে তাদের ধর্ম পরিশ্রমী ও উদ্যমী হতে শিক্ষা দেয়নি। একটু উদ্যমী হলে তারা রাজমিস্ত্রির কাজটা শিখে নিতে পারত। উড়িষ্যায় দারিদ্রেরও অভাব নেই, দরিদ্রেরও অভাব নেই। তাহলে তারা এই রাজমিস্ত্রির কাজটা শেখেনা কেন? উত্তর বোধহয় খুব কঠিন নয়। উদ্যমের অভাব। তাদের ধর্ম ও ধর্মনিষ্ঠা তাদেরকে উদ্যমী করতে পারেনি। তাই সমস্ত নির্মাণ কার্যের জন্য সুদূর মুর্শিদাবাদ থেকে রাজমিস্ত্রি ও যোগাড়ে নিয়ে যেতে হয়। ধর্মপ্রাণ উড়িষ্যাবাসীদের এই উদ্যমের অভাবই হল কালছিদ্র। এই ছিদ্র দিয়েই প্রবেশ করবে শনি। স্বয়ং জগন্নাথদেবও সেই শনিকে আটকাতে পারবেন না।

বলাঙ্গিরের ব্রাহ্মণ গৃহস্থ হরিশচন্দ্র আচার্যের বাড়ীতে নির্মাণকার্যে লেগেছিল নইমুর শেখ। তার বয়স আন্দাজ ৩৫। এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে নইমুর ঐ বাড়ীর মেয়ে শিবানী আচার্য্যকে নিয়ে পালিয়ে গেল। বাড়ীর সকলের মাথায় হাত। চারিদিকে খোঁজ পড়ে গেল। বলাঙ্গিরেই আরও যত রাজমিস্ত্রি কাজ করত, তাদেরকে চাপ দিয়ে নইমুরের বাড়ীর ঠিকানা পাওয়া গেল। এটুকুও সম্ভব হল উড়িষ্যার মুসলমানের সংখ্যা ও প্রভাব অনেক কম বলে। বলাঙ্গির জেলায় মুসলমান মাত্র ০.৫ শতাংশ।

শিবানীর বাবা সরকারী অফিসার। তার উপর প্রভাবী। সুতরাং, পুলিশে অভিযোগ তো দায়ের করা হলই। পুলিশের সাহায্যও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেল। কিন্তু এরকম ঘটনা তো প্রথম নয়। দেশব্যাপী এরকম লক্ষ লক্ষ ঘটনা ঘটে। সুতরাং অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শও পাওয়া গেল। তাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেল যে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই শুধু পুলিশ দিয়ে মেয়ে উদ্ধার হয় না। যেমন এই কয়েকদিন আগে বারুইপুর থানার পুলিশ অফিসার এক অপহৃতা ও পুণে পতিতা পল্লীতে বিক্রি হয়ে যাওয়া মেয়ের হতভাগ্য বাবাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছিল ঐ মেয়েকে উদ্ধারে সাহায্যের জন্য। ঐ অফিসার ৬জন পুলিশ নিয়ে গিয়েও (মেয়ের বাবা সহ) পুণে থেকে ঐ মেয়েকে উদ্ধার করে আনতে পারেনি এবং ঐ অফিসার জানত যে ক্যানিং-এর এরকম একটা বিক্রি হয়ে যাওয়া মেয়েকে আমরা পুণের ওই 'বুধবার পেঠ' পতিতাপল্লী থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলাম পুলিশ না নিয়ে গিয়ে। সুতরাং শিবানীর বাবা হরিশচন্দ্র শুধু পুলিশের উপর ভরসা না করে হিন্দু সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সঙ্গেও যোগাযোগ করলেন। বজরং দলের সর্বভারতীয় সহ সংযোজকের বাড়ী উড়িষ্যায়। তিনি আমাকে বিষয়টি জানালেন এবং সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করলেন। আমি বললাম যে ওখান থেকে মেয়ের বাড়ীর লোক পাঠালে আমরা যতটা পারি সাহায্য অবশ্যই করব। এই কথা বলার সময় আমার মনে হচ্ছিল যে মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি ব্লকে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ৬৫ শতাংশ। সেখানে আমরা কতটা কি করতে পারব!

যাইহোক, গত ৩রা মে বলাঙ্গির থেকে দুজন পুলিশ অফিসার একজন কনস্টেবল, মেয়ের বাবা হরিশচন্দ্র আচার্য্য এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দুজন কর্মী কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। একজন অফিসার খুবই চৌখস ও দক্ষ। তাকে নাকি বলাঙ্গিরের এস. পি. সাহেব বিশেষভাবে দায়িত্ব দিয়েছেন মেয়েটিকে যেভাবে হোক উদ্ধার করে আনার জন্য। ইতিমধ্যে নইমুরের গ্রাম ফতেপুরে ওয়াচ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সৌভাগ্যবশতঃ ওই গ্রামেও কিছু হিন্দু আছে এবং কাছেই ভারত সেবাশ্রম সংঘের খুব বড় আশ্রম আছে যেখানে অনেক হিন্দু আবাসিক ছাত্র থাকে। তাদের সঙ্গে আমরা নিয়মিত যোগাযোগ রেখে খবর নিচ্ছি। এদের কাছ থেকেই জানা গেল যে নইমুর একটা নতুন মেয়েকে নিয়ে এসেছে। মেয়েটি বাংলা ভাষা বোঝে না এবং সে তিনদিন পর্যন্ত না খেয়ে ছিল। এসব কথা জানা গেল এই কারণে যে ওই নইমুরের বাড়ীতে কিছু হিন্দুদের নিয়মিত যাতায়াত আছে। আরও জানা গেল ওই নইমুরের আগে থেকেই একটা বিবি আছে এবং তার ৫টি সন্তান। সবগুলিই ছোট ছোট।

উড়িষ্যার দল কলকাতায় আসার আগের দিনই বালিগঞ্জ শ্রীনাথ হলে একটি পুস্তক প্রকাশের অনুষ্ঠানে আমি ভারত সেবাশ্রম সংঘের যোদ্ধা সন্ন্যাসী মুর্শিদাবাদ জেলার হিন্দুদের একমাত্র আশ্রয়স্থল স্বামী প্রদীপ্তানন্দজীকে বিষয়টি বলে রেখেছিলাম। উড়িষ্যার দল কলকাতায় পৌঁছনোর পর স্বামীজি মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে ভালভাবে কথা বলে রাখলেন। উড়িষ্যার দলকে কলকাতা থেকে গাড়ী ভাড়া করে দিলাম। বের হতে বেলা ১১টা হয়ে গেল।

বিকেলে বহরমপুর পৌঁছে একজন অ্যাডিশনাল এস.পি.র সঙ্গে দেখা করে তাঁর আদেশ নিয়ে সুতি থানায় গিয়ে এরা পৌঁছলেন রাত্রি ন'টায়। বিষয়টি গোপন রাখার জন্য ইচ্ছে করেই দেরী করে যাওয়া হল। সুতি থানার ও. সি. আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করলেন। আমার এরকম অনেক অনেক অভিজ্ঞতা আছে যে এরকম ক্ষেত্রে থানা থেকে মুসলিম দুষ্কৃতকারীদের দালাল স্টাফরা রেড্-এর খবর আগে থেকেই তাদেরকে জানিয়ে দেয়, যার ফলে তারা মেয়েটিকে সরিয়ে দেয়।

সুতি থানার পুলিশ ও উড়িষ্যার পুলিশ একসঙ্গে রাত্রি ১২টার সময় নইমুরের বাড়ি রেড করল। সঙ্গে মেয়ের বাবা ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দুই কর্মী। বাড়ি মানে টিনের দেওয়াল ও দরমার চালের দুটি ঘর। পুলিশ জীপের হেডলাইটের আলো দেখেই নইমুর ঘরের চাল ফুঁড়ে লাফিয়ে পালাল। এ থেকেই বোঝা যায় কেমন ঘর। ওই ঘরটিতে সে ও শিবানী আচার্য্য শুয়েছিল। আর পাশের ঘরটায় নইমুরের পুরানো বিবি ৫টি সন্তানকে নিয়ে ছিল। দরজায় ধাক্কা মারতে শিবানী দরজা খুলে বেরিয়ে এল। মেয়েকে দেখেই বাবা মেয়ের হাত ধরে কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন যে, তুই আমার সঙ্গে এখনই বাড়ি চল্। তোর মা খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, তুই না গেলে তোর মা মরে যাবে। তখন শিবানী যেভাবে বাবার সঙ্গে কথা বলতে লাগল তা শুনে সবাই অবাক হয়ে গেল। অত্যন্ত রূঢ়, অভদ্র ও তেজীভাবে সে বাবার সঙ্গে ও সকলের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। সে জোরের সঙ্গে বলল যে সে স্বেচ্ছায় এসেছে, সে এখানে খুব ভাল আছে এবং সে ফিরে যাবে না। উড়িষ্যার পুলিশকে সে উড়িয়া ভাষায় বলল যে, নইমুর তাকে নিয়ে আসতে চায়নি, সেই জোর করে নইমুরের সঙ্গে চলে এসেছে। সে সাবালিকা-এটাও সে জোর দিয়ে জানাল। উড়িষ্যার পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসা করল, যে লোকটা পালিয়ে গেল সে শিবানীর কে হয়? শিবানী জোরের সঙ্গে উত্তর দিল 'স্বামী হয়'। পুলিশ আবার জিজ্ঞাসা করল যে ওই 'লোকটার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক'? মেয়েটি আবার তেজের সঙ্গে পুলিশকে উত্তর দিল, 'তুমি পুলিশ অফিসার হয়েছ, আর স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর কি ধরণের সম্পর্ক হয় তা তুমি জান না?'

শিবানীর এই আচরণে উড়িষ্যা থেকে আসা দলটি শুধু অপ্রস্তুতই হল না, তারা জোর ধাক্কা খেল। উড়িষ্যার কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা তাদের মা-বাবার সঙ্গে এইরকম ঔদ্ধত্য নিয়ে কথা বলে না। শিবানীও এর পূর্বে কোনদিন এরকম আচরণ করে নি। তার এই ব্যবহারের পরিবর্তন কল্পনাতীত। ওই দলের সঙ্গে থাকা উড়িষ্যা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পূর্ণকালীন কর্মী হেমন্তভাই আমাকে ঘটনার বিশদ বর্ণনা দিয়ে পরে জানাল যে, বলাঙ্গিরে শিবানীদের বাড়ির যে মেন গেটটা আছে, শুধু সেটার দাম নইমুরের গোটা বাড়িটার থেকেও বেশি। তার উপর সে পাঁচ সন্তানের বাপ। তার উপর তাদের খাওয়া দাওয়ার ভিন্নতা।। হেমন্তভাইয়ের বক্তব্য, মনে হচ্ছিল যেন কথাগুলো শিবানীর কথা নয়। তার মুখ দিয়ে অন্য কেউ বলছে। শুধু তাই নয়, শিবানী তার বয়সের প্রমাণপত্র কাগজ ঘর থেকে বের করে এনে পুলিশকে দেখাল। এই পরিস্থিতিতে সুতি থানার পুলিশ অফিসার উড়িষ্যার পুলিশকে জানালেন যে এই অবস্থায় তাঁরা নিরুপায়। সাবালিকা মেয়েকে তাঁরা জোর করে তুলে নিয়ে যেতে পারেন না। রিজানুরের কেসের ভুত পশ্চিমবঙ্গের পুলিশকে সবসময় তাড়া করছে। তাই এক্ষেত্রে মেয়েটির মোহ কাটানোর বা তাকে বোঝানোর কোন সুযোগ তার বাবা পেলেন না। পুরো দলটি লজ্জায় মাথা নীচু করে ফিরে এল।

ঘটনার বিশদ বিবরণ দিলাম। কিন্তু এই বিবরণ দেওয়াটাই আমার উদ্দেশ্য নয়। যে কথা কাউকে বলে বোঝাতে পারি না, সেটা লেখার জন্যই এই দীর্ঘ বিবরণ। এরকম ঘটনা আমার কাছে বহু আসে। যখন এই লেখা লিখছি, তখনও আমার বাড়িতে একটি ১৬ বছরের সম্পূর্ণ অশিক্ষিত মেয়ে আছে যে ধর্ষণের শিকার হয়ে কোনরকমে পালিয়ে এসে আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। আগামীকাল তাকে হিন্দু সংহতির কর্মীর সঙ্গে মন্দিরবাজার থানায় পাঠাব F.I.R. করার জন্য। এরকম বহু বহু ঘটনার বিশদ বিবরণ আমি শুনেছি, অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। এমনকি ভিক্টিম মেয়েগুলোর কাছ থেকেও শুনেছি। এই সব শুনে শুনে শুনে শুনে আমি মনে করতে বাধ্য হয়েছি— যে কথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না— এই মুসলমানরা নিশ্চয় কোন ওষুধ অথবা তুক্তাক্ অথবা শেকড়বাকড়, অথবা মন্ত্রতন্ত্র হাতে পেয়েছে যা দিয়ে তারা যে কোন মেয়েকে কিছু সময় বা কিছুদিনের জন্য হিপ্নোটাইজ করে রাখতে পারে। যদি এসব তুক্তাক্ কিছু নাই হয়, তাহলেও মনস্তাত্ত্বিক চাপ (Phychological Pressure) সৃষ্টির কোন একটা বিশেষ পদ্ধতি, টেকনিক্ তারা আয়ত্ব করেছে। এ দুটোর অন্ততঃ যে কোন একটা না হলে ভাল ভাল পরিবারের হিন্দু মেয়েরা এমন অসম স্তরের মুসলিম ছেলের (বহু ক্ষেত্রেই ঐ মুসলমানরা আগে থেকেই বিবাহিত থাকে) সঙ্গে চলে যেতে পারে না এবং এমন বিষম পরিস্থিতিতে গিয়ে থাকতে পারে না। আমার কেমন যেন মনে হয় যে 'লাভ জেহাদ' বলে ব্যাপারটাকে হাল্কা করে দেওয়া হচ্ছে। বহু কেস স্টাডি করে আমার এই গভীর প্রত্যয় জন্মেছে যে এর মধ্যে কোন 'লাভ' নেই। আছে কোন ট্রিক, কোন কৌশল, কোন ওষুধ অথবা কোন অত্যন্ত effective সাইকোলজিক্যাল পদ্ধতি। এর মধ্যে যেটাই হোক না কেন, আমরা তার হদিস জানি না। তাই তার প্রতিকারের কোন পদ্ধতি আমরা বের করতে পারি না। আমাদের এই অজ্ঞানতা, অক্ষমতা ও অসহায়তা আমাকে সব সময় কুরে কুরে খায়। এই যন্ত্রণা থেকে একটা দিনও আমি রেহাই পাই না।

এই লেখার মাধ্যকে আমি সকলকে আবেদন জানাচ্ছি, কেউ যদি ঐ ট্রিকস্ অথবা তার কোন প্রতিকারের সন্ধান পান, দয়া করে আমাদেরকে জানান। বহু বোনেদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে, কালো বোরখার আড়ালে চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার অভিশাপ থেকে আমরা রক্ষা করতে পারব।

কলকাতায় মুসলিম সংরক্ষণ বিরোধী মিছিল

শিক্ষা ও কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ মুসলিম সংরক্ষণের প্রতিবাদে 'হিন্দু সংহতির' উদ্যোগে গত ১১ ই এপ্রিল '১০ রবিবার মধ্য কলকাতার এন্টালীর শীল লেনের মাঠ (লোকনাথ মন্দিরের সামনে) থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল–ট্যাংরা এন্টালীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। রাস্তার দুধারের পথচলতি মানুষ ও দোকানদারদের সংহতির কর্মীরা ধর্মীয় সংরক্ষণ বিরোধী প্রচারপত্র বিলি করেন।

পরিক্রমা চলার পথে বিভিন্ন রাস্তার সংযোগস্থল গুলিতে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে সংরক্ষণের প্রতিবাদে বক্তব্য রাখা হয়। বক্তব্য রাখেন অমল কুমার দে, সুষেন বিশ্বাস, হরিহর প্রসাদ সাউ, পার্থসারথি চৌধুরী, হরিনারায়ণ তেওয়ারী, চাঁদ রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ হিন্দু সংহতির নেতৃবৃন্দ। শেষে এন্টালীর বামুনপাড়া বাজারের মুখে একটি পথসভার পর সভা তথা পরিক্রমা সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিক্রমা শুরুর আগে থেকে পরিক্রমা তথা সভা সমাপ্তি পর্যন্ত এন্টালী এবং টাংরা থানার পুলিশ সঙ্গে থাকে।

দু ঘন্টা পরিক্রমা পথে 'সংবিধান বিরোধী–সংরক্ষণ মানছি না মানব না', 'বন্দেমাতরম্' 'ভারতমাতা কী জয়', 'জয় শ্রী রাম', 'সংখ্যালঘু তোষণ বন্ধ কর' ধ্বনিতে সাধারণ হিন্দু জনগণ যেন তাদের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ খুঁজে পেয়েছেন। কারণ পরিক্রমা চলাকালীন অনেকেই মিছিলে পা মিলিয়েছেন। এই প্রতিবাদ খুব প্রয়োজন জানিয়ে তাদের একান্ত সমর্থনের কথা বলেছেন।

ঠাকুরনগর ও গাইঘাটায় জনসভা

ঠাকুরনগর ও গাইঘাটায় গত ৪ঠা ও ৭ই মে ধর্মীয় সংরক্ষণ বিরোধী জোরালো ধিক্কার সভা আয়োজন করা হয়। ঠাকুরনগর স্টেশন বাজারে নেতাজী মূর্তির সামনে জনসভায় কয়েক হাজার মানুষ শ্রোতা ছিলেন। সেখানে দু'শ কর্মীর মিছিলও হয়।

বাগনানে মুসলিম মাস্তানির প্রতিরোধে সংহতি

গত ২৩ এপ্রিল স্থানীয় সিপিএমের এক মুসলিম নেতার ভাই ও কংগ্রেসের আর এক মুসলিম নেতার (যে বাগনান কলেজে কিছুদিন আগে মাস্তানির অভিযোগে মারধোর খায়) নেতৃত্বে কিছু মুসলিম যুবক বাগনান রেল ব্রীজের উপর কয়েকজন হিন্দু যুবতীকে কুরুচিপূর্ণ ইঙ্গিত করে। হিন্দু যুবতীরা রেলওয়ে বুকিং কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সংহতির কর্মীদের কাঁদতে কাঁদতে সে কথা বলে। সঙ্গে সঙ্গে সংহতি কর্মীরা ঐ মুসলিম যুবকদের কাছে গিয়ে উত্তমমাধ্যমের ব্যবস্থা করতেই তারা ক্ষমা চায় ও সেদিনের মত ব্যাপারটি মিটে যায়। পরের দিন বিভিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত গ্রাম থেকে প্রায় ৭০/৮০ জন মুসলিম যুবক বাগনান বাস স্ট্যান্ডে হিন্দু সংহতির কর্মীদের আক্রমণের জন্য জড় হয়। খবর পেয়ে সংহতি কর্মীরাও প্রায় ১০০ জনের মত একটি দল বাগনান বাস স্ট্যান্ডে জড় হয়ে পড়ে। সংহতি কর্মীদের এই মনোবল ও সংখ্যাধিক্য দেখে মুসলিম যুবকেরা রণে ভঙ্গ দেয়। কিন্তু বাগনান থানায় ফোন করে ওরা পুলিশ পাঠিয়ে দেয় এবং যথারীতি তিনজন নিরীহ যুবককে থানায় তুলে নিয়ে যায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংহতি কর্মীদের নেতৃত্বে মুরালিবাড় গ্রামের নারীপুরুষ নির্বিশেষে প্রায় ২৫০ জন থানা অবরোধ করে। ফলে পুলিশ ঐ তিনজন হিন্দু যুবককে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। আসলে বাগনান বাস স্ট্যাণ্ডে মুসলিম মাস্তানদের তোলা আদায়ের কাজে বাধা সৃষ্টি করায় সংহতির কর্মীদের উপর মুসলিমরা ক্রুদ্ধ । এইসব ঘটনা তারই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু ২৩ এপ্রিলের ঘটনায় সংহতি কর্মীদের সাহসী প্রতিরোধ স্থানীয় ব্যবসায়ী ও হিন্দুদের মনে মুসলিম ভীতি বেশ কিছু পরিমাণে কাটাতে সক্ষম হয়েছে।

নমিতা মণ্ডলের উপর চড়াও মুসলিম দুষ্কৃতি

৮ এপ্রিল, ২০১০। নদীয়া জেলার হরিণঘাটা থানার নগর উখড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সিংহা মাঠপাড়া গ্রামের গোবিন্দলাল মণ্ডলের স্ত্রী নমিতাকে নির্দয় ভাবে মেরে গুরুতর আহত করায় পুলিশ কুতুবুদ্দীন, তার ভাই নাজিবুদ্দীন এবং বাবা লতিফ মিঞাকে গ্রেপ্তার করে। (কেস নং ৭৮/২০১০, হরিণঘাটা থানা) তারা ৩ দিনের মধ্যেই জামিন পেয়ে যায়।

কুতুবদের অভিযোগ যে গোবিন্দর প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলের দু'টি হাঁস তাদের জমির ফসল নষ্ট করে দিয়েছে। তাই তারা গোবিন্দর বাড়িতে জোর করে ঢুকে হাঁস দু'টো ধরে চিৎকার করে বলতে থাকে হাঁস দুটোকে কেটে ফেলবে ও নোংরা গালাগালি দিতে থাকে। সে সময় গোবিন্দ এবং রবীন্দ্র কেউই বাড়ীতে না থাকায় গোবিন্দর স্ত্রী নমিতা প্রতিবাদ করলে কুতুবরা সপরিবারে-নমিতার উপর চড়াও হয়ে গুরুতর ভাবে জখম করে। পরে গোবিন্দ খবর পেয়ে বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে হাপানিয়া হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখান থেকে আবার জাগুলিয়া হাসপাতাল, মরণ-বাঁচন সমস্যা। ছোটখাট গ্রাম্য বিবাদ হলে কি হয়, ব্যাপারটা হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের হলেই রং অন্য দিকে ছোটো। কুতুবের হুমকি রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়ার, ছাড়া পেলে লাশ ফেলে দেওয়ার (পুলিশের সামনেই উক্তি) ইত্যাদি চলে। তাদের সমর্থকও জুটে যায়। সফিক ও রহিম মিঞা অন্য হিন্দুদেরও (বিধান রায়) ধমকাচ্ছে— হিন্দুরা চুপ করে না থাকলে তাদের খতম করে দেওয়া হবে! গ্রাম্য বিবাদও কি গড়াবে হিন্দু-মুসলিম রক্তপাতের দিকে? এসব কঠোর হাতে দমন করা দরকার।

বিদ্যালয়ে 'নামাজ' কি বাধ্যতামূলক

বাগনানে দামোদর নদীর তীরে মাধবপুর গ্রামের পাশেই সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত নজরুল বিদ্যাপীঠ। ঐ স্কুলে আরবী পড়ানো হয়। শিক্ষক মহম্মদ হিদায়েতউল্লা গাজী। বাড়ী দক্ষিণ ২৪ পরগণায়। তিনি নবম শ্রেণীর ছাত্রদের নামাজ পড়ানোর ব্যবস্থা কৌশল করে চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু একটি হিন্দু ছাত্র এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করায় তাকে শিক্ষক হিদায়েতউল্লা ক্লাস থেকে বের করে দেন। পরদিন ৩০/৪/২০১০ তারিখে ঐ ছাত্রটির অভিভাবকসহ কয়েকজন স্থানীয় হিন্দু প্রতিবেশী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে অভিযোগ জানাতে গেলে স্থানীয় মুসলমান দোকানদাররা রে রে করে তেড়ে আসে ও ঐ হিন্দু প্রতিনিধি দলের উপর চড়াও হয়ে কুৎসিত গালিগালাজ করে এবং দাঁড়িয়ে থাকা এক হিন্দু যুবক শ্রী ঋষিকান্ত দন্ডবতের নাকে সজোরে ঘুসি মেরে তার নাক ফাটিয়ে দেয়। তার নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়তে থাকে। শ্রী দন্ডবত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ও সঙ্ঘের মহকুমা দায়িত্বের একজন কার্যকর্তা। যাইহোক ঐ শিক্ষক হিদায়েতউল্লার বিরুদ্ধের থানায় F.I.R. করা হলেও পুলিশ নির্বিকার। এলাকায় তৃণমূল দলের প্রভাব থাকলেও স্থানীয় নেতৃত্ব আক্রমণকারীরা মুসলিম বলে মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। তবে কি সরকারী বিদ্যালয়ে এবার থেকে হিন্দু ছেলেদেরও নামাজ পড়তে হবে?

শান্তিপ্রিয় ডায়মণ্ড হারাবার সংখ্যাগুরু পাড়ায় বহিরাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংগঠিত

আক্রমণের প্রতিবাদের পি. ডি. এস.-এর সভা

ডায়মণ্ড হারবার ছোট্ট শান্তিপ্রিয় শহর। কিন্তু গত ৩ এপ্রিল পি. ডি. এস. এর এক প্রকাশ্য প্রতিবাদ সভায় জানা গেল যে, সামান্য ছোট্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে পি. ডি. এস. এর জেলা সভাপতি কল্লোল মৈত্র এবং তাঁর স্ত্রী প্রাক্তন ১৩ নং ওয়ার্ড কমিশনার মৌসুমী মৈত্র এর বাড়িতে ব্যাপক ইটবর্ষণ এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ, এমনকি বহিরাগত এবং ১৫ নং ওয়ার্ডের কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ উপস্থিত হয়ে পুলিশের সামনে, কল্লোল মৈত্র এবং স্ত্রী মৌসুমী মৈত্রর সামনেই সকলের গলার নলি কেটে দেবে বলে হুমকি দিতে থাকে। এমনকি গ্রিল বেয়ে দোতলায় উঠে গিয়ে কল্লোল মৈত্রর হাত ধরে টেনে নামানোর চেষ্টা করা হয়। ঘটনা হল কল্লোর মৈত্রর ছেলে অর্ঘ্য মৈত্র যখন ঘটনার দিন বিকেলে বাইক চালিয়ে জনতা হোটেলের পাশ দিয়ে নেমে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল তখন বাইকের লুকিং গ্লাসটি একটি মুসলিম ছেলের গায়ে লাগে। এই সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে এত বিপুল সংখ্যায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ কিভাবে একত্রিত হতে পারে এবং ঘটনা না বুঝে একজনের বাড়িতে চড়াও হতে পারে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কল্লোল মৈত্র এবং মৌসুমী মৈত্র বলেন ''সেদিন যদি পাল্টা কোন মার দেওয়া হত তবে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিস্থিতি তৈরী হত''। ২০-২৫ দিন আগে ঐ মুসলিম সম্প্রদায়ের ছেলেগুলি ১৩ নং ওয়ার্ডেই এক প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার ভাগ্নীকে টোন-টিটকিরি করে, ঐ সময় পাশ দিয়ে অর্ঘ্য মৈত্র এবং ঐ তৃণমূল নেতার ছেলে যাচ্ছিল। প্রতিবাদ করায় ঐ তৃণমূল নেতার ছেলে ও অর্ঘ্য মৈত্র সঙ্গে তাদের বচসা ও হাতাহাতি হয়। মুসলিম ছেলেগুলি মার খেয়ে অন্যায় স্বীকার করে চলে যায়, এবং শাসিয়ে যায়, এর বদলা নেবে। তারই ফলস্বরূপ ২১-০৪-১০ এর ঘটনা বলে সকলেই ধারণা। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, এলাকার উঠতি মস্তান ও ইভটিজার তাইমুর শেখের লোকজন কল্লোল মৈত্রের বাড়ি আক্রমণের পুরোভাগে ছিল। ঐ দিন ঐ সভাতেই সোমা দাস নামে স্থানীয় ঐ ১৩ নং ওয়ার্ডেরই এক গৃহবধূর মুখ থেকে শোনা গেল এক মাস আগে ডায়মণ্ডহারবারে তাদের প্রিন্স লেদার দোকানের সামনে জনৈক মুসলিম হকারের বসাকে কেন্দ্র করে একই কায়দায় দোকানদারকে শাসানো হয়। এবং দোকান লুঠ করার চেষ্টা করে। ঐ সভা থেকে আরো জানা গেল যে, ঐ গোষ্ঠীটি এই কাজকর্মে জড়িত। এরাই মাঝে মধ্যে রবীন্দ্রভবন এলাকায় মাঝরাত্রে রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে তোলা আদায় করে থাকে। এই প্রতিবাদ সভার ঠিক আগে রাত্রে কপাট হাটের বাসিন্দা শেফালী হালদারের বাড়িতেও বহিরাগত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ জড়ো হয়ে রাত্রে পাঁচিল ভাঙচুর এবং ইটবর্ষণ, গালিগালাজ ও শাসানি পুলিশের উপস্থিতিতেই করতে থাকে। এমনকি উক্ত ঘটনার প্রতিবাদ করার জন্য স্থানীয় ফকিরচাঁদ কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক পান্নালাল হালদারের বাড়িতেও হামলার চেষ্টা চালানো হয়। সংবাদে প্রকাশ এই আক্রমণের নেতৃত্বে ছিল এলাকার মাটি কাটার দালাল চক্রের নেতা নুরুদ্দিন।

মুসলিম যুবকদের
সর্বত্র হিন্দু মেয়েদের টিজিং-এর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে

গত ২১/০৪/১০ তারিখে বাগনান থানার কল্যাণপুর হাইস্কুলের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কয়েকজন মুসলিম যুবক বিদ্যালয়ে প্রবেশরতা হিন্দু ছাত্রীদের বিভিন্নরূপে টিজ করতে থাকে। ফলে তারা প্রধান শিক্ষক শ্রী মানস কুমার মণ্ডলের কাছে অভিযোগ জানায়। শ্রী মণ্ডল তখন স্কুলের গেটের কাছে ঐ মুসলিম যুবকদের তাড়িয়ে দেন। স্কুলছুটির পর প্রধান শিক্ষক তাঁর বাড়ি হিজলক্ গ্রামে ফেরার সময় রাস্তায় পিছন থেকে মুসলিম যুবকরা তাঁর পিঠে থান ইঁট ছুড়ে মারে। ইঁটের আঘাতে প্রধান শিক্ষক প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয় লোকজন ছুটে আসে। তাদের প্রচেষ্টায় দুই মুসলিম যুবক সেখ সাদ্দাম ও সেখ রাজেশকে হাতে-নাতে ধরে ফেলে ও পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পরে স্কুলের পরিচালন কমিটির পক্ষ থেকে থানায় এলেও ধৃত মুসলিম যুবকদের বিরুদ্ধে তারা কোন অভিযোগ দায়ের করেননি। ফলে বাগনান থানার পুলিশ ঐ দুষ্কৃতকারী মুসলিম যুবকদের থানা থেকে ছেড়ে দেয়। এই ঘটনা প্রমাণ করে হিন্দু মেয়েদের টিজ করা মুসলিম যুবকদের একটি স্বাভাবিক অধিকার হিসাবে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ বিরোধী পুস্তক প্রকাশ

বালিগঞ্জ, কলকাতা, ২ মে, ২০১০। ভারত সেবাশ্রম সংঘের সর্বভারতীয় সম্পাদক স্বামী বুদ্ধানন্দজী 'ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ ঃ একটি সর্বনাশা পদক্ষেপ' শীর্ষক একটি বই উদ্বোধন করেন। বইটি লিখেছেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক শ্রী দেবজ্যোতি রায় এবং প্রকাশ করেছেন হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন কুমার ঘোষ। আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী ভাবগম্ভীর এই অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন ইতিহাসচেতন এবং ধর্মশাস্ত্রবিদ্ স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ। কলকাতা শহর, শহরতলি এবং বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় একশ'জন বুদ্ধিজীবী উপস্থিত হয়েছিলেন। বইটির প্রতিপাদ্য বিষয়, সাচার কমিটি এবং রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের রিপোর্টের দোহাই দিয়ে সংবিধান বহির্ভূত পথে ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমানদের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সংরক্ষণ দেবার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তাতে দেশের এবং সমাজের যে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে তথ্য ও যুক্তি দিয়ে তা বিশ্লেষণ করা। প্রথম বক্তা স্বামী বুদ্ধানন্দজী বলেন, ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ প্রক্রিয়া ভারতের অমঙ্গল ডেকে আনবে। এ ব্যাপারে আলোচ্য বইটিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশিত হয়েছে যা দেশপ্রেমিক মানুষকে আন্দোলনের পথ দেখাবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন কুমার ঘোষ, অধ্যাপক পুলক নারায়ণ ধর (বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী) অল ইণ্ডিয়া রিফিউজি ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রত্নেশ্বর সরকার, ব্যরিষ্টার সুরেশ প্রসাদ মজুমদার, অধ্যাপক ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, ইতিহাসবিদ্ শ্রীনির্মলেন্দু চক্রবর্তী, ডাঃ হরিপদ রায় এবং গ্রন্থকার শ্রী দেবজ্যোতি রায়। সকল বক্তাই সংবিধানবিরোধী সংরক্ষণ দেবার প্রক্রিয়ার তীব্র নিন্দা করেন।

স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ বলেন, ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে এবং এই বিভেদ ভারতের সংহতিকে বিপন্ন করবে। তিনি আলোচ্য গ্রন্থটিতে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো অনুধাবন করার জন্য আহ্বান জানান। তাঁর বিচারে শ্রী দেবজ্যোতি রায়-এর প্রতিটি লেখাই অসি-সদৃশ। এ লেখাটিও। শ্রীরায় সহ অনুষ্ঠানে যে সকল লেখক উপস্থিত ছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেন, আজকের সমস্যা এবং তার প্রস্তাবিত সমাধানের উপর লিখুন। এই লেখাগুলো প্রকাশ ও প্রচারে ভারত সেবাশ্রম সংঘ সহায়তা দেবে।

প্রকাশক, মুদ্রক ও সত্ত্বাধিকারী প্রকাশ চন্দ্র দাস কর্তৃক ৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ চিত্তরঞ্জন দে
ফোন ঃ ০৩৩-২২৫৭ ২৬৮৮, ৯৪৩৩৪ ৫৩১০৯, ইন্টারনেট ঃ http://hindusamhati.blogspot.com, ই-মেল ঃ prokash.das@rediffmail.com